ইউনিট ২

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শ বা শূরা ভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম নাগরিকই সকল গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় ব্যাপারে রায় জানার অধিকার রাখেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে সকল প্রকার নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে নাগরিকের সাথে পরামর্শ করা, তাদের রায় ও মতামত জানা একান্ত অপরিহার্য। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যই মজলিসে শূরা গঠন করা অত্যাবশ্যক। মজলিসে শূরা রাষ্ট্রের মুসলিম জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। তবে কেউ এ পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। কেননা ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসাতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন পদ্ধতির সরকার রয়েছে, ইসলামী সরকার পদ্ধতি এ সকল পদ্ধতি থেকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামী রাজনীতিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর অন্যান্য পদ্ধতিতে সরকার হচেছ সার্বভৌমত্বের মালিক। এখানেই হল ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে অন্যান্য পদ্ধতির পার্থক্য। ইসলামী সরকার পদ্ধতি ও সমকালীন অন্যান্য সরকার পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে মুসলমান, পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, বোধশক্তি সম্পন্ন , আমানাতদার, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান ও আল্লাহভীরু, পদলোভী, অর্থলোভী না হওয়া প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধানকে সকল জনকল্যাণকর কাজ করতে হবে। আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটকে ৭টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১: ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচন।
- ❖ পাঠ-২: মজলিসে শূরা ও সংসদীয় গণতন্ত্র।
- ❖ পাঠ-৩: মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- ❖ পাঠ-৪: ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা।
- ❖ পাঠ-৫: ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকার পদ্ধতির তুলনা।
- ❖ পাঠ-৬: ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলী।
- ❖ পাঠ-৭: ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠ ঃ ১

ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সাধারণ মজলিসের সদস্যদের গুণাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আহলুল হাল্লি ওয়াল-আকদ কারা এবং তাদের গুণাবলী কি কি তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচন-নীতি কি হবে তা বলতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচন

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম নাগরিকই সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে মত ও রায় প্রদানের অধিকারী। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে সকল প্রকার নীতি-নির্ধারণীর ব্যাপারে নাগরিকের সাথে পরামর্শ করা, তাদের রায় ও মতামত জানা একান্ত অপরিহার্য। মুসলিম জনগণের মত বা ভোট না নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কারো অধিকার নেই। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন অপরিহার্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচকের গুণাবলী

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচকের গুণাবলী আলোচনার পূর্বে নির্বাচক কারা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন-

১. প্রত্যক্ষ নির্বাচক

২. পরোক্ষ নির্বাচক

প্রত্যক্ষ নির্বাচক ঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচক হচ্ছেন দেশের জনগণ। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আত্মপ্রকাশ, তাঁর নির্দেশিত শরীআত জনগণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু জনগণের উপর এ দায়িত্ব থাকলেও তারা সরাসরি পালন করতে পারে না। তাই তারা সকল কাজের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তারা একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যিনি হন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান। আইন প্রণয়ন করার জন্য তারা বহুসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করে ; যারা আইন সভার বা মজলিসে শুরার সদস্য নামে পরিচিত। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এ জন্য জনগণ বলতে মুসলিম জনগণকে বুঝায়। তবে অমুসলিম জনগণ যারা আল্লাহকে স্বীকার করে করে না, তারা সকলেই এ পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে এবং ইসলামও তাদের জান, মাল ও মান-সম্মানের অধিকার স্বীকার করে। ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই সংখ্যালঘু চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক অধিকার স্বীকার করেন। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করেন না। এ জন্য চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের ভোট বা রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অধিকার আছে বলে মনে করেন না। তাদের মতে চুক্তিবদ্ধ নাগরিক রাজনৈতিক ভাবে মুসলমানদের অধীন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি ভোগ করলেও রাজনৈতিক অধিকার না থাকার কারণে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক অধিকারও স্বীকৃত। তারা বলেন, মদীনার-সনদের ভিত্তিতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে একটি জাতি বা উম্মাহ গঠিত হয়। মদীনা-সনদে মুহাজির, আনসার, পৌত্তলিক ও ইয়াহূদী সমন্বয়ে একটি উম্মাহ গঠিত হলেও মদীনার নগর রাষ্ট্র ছিল বিশ্বনবী (সা)-এর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে ইসলামী আইনেরই প্রাধান্য ছিল। এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মদীনার ১২টি গোত্র বারজন প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করে বলে জানা যায়। অথচ এ বারটি গোত্রের অনেকগুলোই ইয়াহূদী গোত্র। এদ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিম নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ইসলাম স্বীকার করে। অতএব ইসলামী আইনের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেও অমুসলিম নাগরিকদেরকে রাজনৈতিক অধিকার দেয়া যেতে পারে।

মোটকথা জনগণ আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী পরামর্শের জন্য মজলিসের শূরার সদস্যগণকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করতে পারে। তবে খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে মজলিসে শূরার সদস্যগণ জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হননি বরং খলীফা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিসে শূরার গঠন করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে মজলিস তিন ধরনের ছিল।

১. মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা);
২. মজলিসে আম (সাধারণ সভা);
৩. মজলিসে খাস (বিশেষ সভা)।

পরোক্ষ নির্বাচক ঃ পরোক্ষ নির্বাচক হচ্ছে তিন শ্রেণীর লোক যা নিম্নরূপ-

ক. রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান,
খ. মজলিসে শূরা,
গ. আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ (أهل الحل والعقد)

নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলী

ক. রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানদের গুণাবলী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলী সামনে আলোচিত হবে।
খ. মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী ঃ মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী সামনে আলোচিত হবে।

মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা সদস্যদের গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হবেন।
২. তাঁরা প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেক বৃদ্ধি সম্পন্ন হবেন (পাগল হবেন না)।
৩. তাঁরা আদালত কর্তৃক নাগরিক হিসেবে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।
৪. তাঁরা আদালত কর্তৃক মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।
৫. তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা, ইসলামী ধ্যান-ধারণা বিরোধী সমালোচনা, প্রচার অভিযান চালানো এবং নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য অভিযোগ থাকবে না।

আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ-এর গুণাবলী ঃ

এদেরকে আহলুল ইমামাহ (أهل الإمامة) বা আহলুল ইখতিয়ার (اهل الاختيار) ও বলা যায়। أهل الحل والعقد (আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ) এর অর্থ হচ্ছে ভাংগা গড়ার দল। এর অপর এক অর্থ হচ্ছে, সুশিক্ষিত ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর অর্থ হচ্ছে, এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তি যারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং যাঁদেরকে সর্বসাধারণ অনুসরণ করে।

ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে রাষ্ট্রপ্রধানের পরোক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচনী বোর্ড হিসেবে আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ (أهل الحل والعقد) এর উৎপত্তি। এরা এমন একটি দল যাদের জনগণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে হবে। এ দলের যোগ্যতা সম্পর্কে আল্লামা মাওয়ার্দীর অনুসরণে ডঃ আব্দুল করিম যায়দান তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ-

১. পূর্ণাঙ্গ আদালত সম্পন্ন তথা ন্যায়বান ও সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হওয়া।
২. শরীয়তের নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে জাতির মাঝে কোন লোকটি রাষ্ট্রপ্রধান বা সমাজের ইমাম হওয়ার যোগ্য তা জানা ও বুঝার জ্ঞান ও ইলম থাকা ।
৩. সার্বিক জনকল্যাণের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি চেনার ও বাছাই করার মত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্বা থাকা।

আল্লামা রশীদ রেজা তাফছীরুল মানারে আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ (أهل الحل والعقد) এর গুণাবলী সম্পর্কে লিখেছেন-

والحكماء والعلماء ورؤساء الجند و سائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة

আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ হল সেসব, শাসকবর্গ, বিজ্ঞজন, সেনাবাহিনী প্রধানগণ এবং নেতৃবর্গ যাদের কাছে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রয়োজনে ও সমস্যায়, দেশের কঠিন পরিস্থিতিতে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে আসা-যাওয়া করেন। এদেরকে উলুল আমরও বলে।

আল্লামা রশীদ রেজার উক্তি থেকে বুঝা যায়, আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ নন বরং তাঁরা হলেন দেশের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ।

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচন

মাওলানা আব্দুর রহীম-এর মতে, ভোটাধিকার লাভ হয় ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে। এ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে ভোটাধিকার লাভ করা যাবে না।

নির্বাচনের নীতি

ইসলামের দৃষ্টিতে কেউ নিজে কোন পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। সুন্নাহ অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন পদ প্রার্থী হতে পারবে না, যে পদপ্রার্থী হবে সে তার অযোগ্যতা প্রমাণ করবে। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সাথে দু'জন সাহাবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে পদ প্রার্থনা করলেন। তিনি তখন দাঁত পরিষ্কার করছিলেন। একথা শুনে তাঁর দাঁত মাজা থেমে গেল। তিনি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে দেখে ক্রোধ প্রকাশ করলেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, এ লোক দুটোর মনের খবর আমি জানতাম না। তারা যে পদপ্রার্থী তাও জানতাম না। বিশ্বনবী (সাঃ) বললেন-

والله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله و لا أحدا حرص عليه

"আল্লাহর শপথ, এই কাজে আমি এমন কাউকে নিযুক্ত করব না যে তা প্রার্থনা করে এবং তাকেও না যে এজন্য আগ্রহী হয় ও লোভ করে।"

এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারে না। নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন, পোস্টার, হ্যান্ডবিল ও প্রচার পত্র ছাপানো এবং তা দেয়ালে দেয়ালে লাগানো তো প্রশ্নই উঠে না। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, বিরোধী প্রার্থীর চরিত্র হরণ, তার অযোগ্যতা প্রমাণ করা ইত্যাদি কাজ ইসলামী দৃষ্টিতে অতি জঘন্য। ভোট আদায়ের জন্য অর্থ বন্টন, ওয়াদা করা ইত্যাদি ইসলাম বৈধ মনে করে না।

তাহলে নির্বাচন কিভাবে সম্পন্ন হবে ? এ প্রশ্নের জওয়াবে মাওলানা আব্দুর রহীম (র) বলেন, "ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হবে সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে। নির্বাচন গ্রহণের সহজ এবং কার্যকর পন্থা এ হতে পারে যে, নির্দিষ্ট তারিখে ভোট কেন্দ্রে প্রত্যেক ভোটদাতা উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ এলাকার লোকদের মধ্য হতে সবচেয়ে খাঁটি ও আদর্শবাদী ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে ভোট দিয়ে আসবে।"

কেউ প্রার্থী না হলে নির্বাচন কিভাবে হবে এ প্রশ্নে ডঃ আব্দুল করিম যায়দানের মতামত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে নিজে প্রার্থী হওয়া শরীঅতে অবৈধ এ কথা ঠিক। একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবেই তা অনুকরণ করা যায়। তবে যদি তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং শরীঅতের দৃষ্টিতে তা অকল্যাণকর মনে না হয়, তবে তা আর অবৈধ হতে পারে না। জনসাধারণকে ভালভাবে জানতে হবে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে। তা না জানলে সে নির্বাচন করতে পারে না। কিন্তু তার পক্ষে এরূপ জানা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার জানা থাকলে এবং ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে নির্বাচিত ব্যক্তি কাজ করতে অস্বীকারও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন অনর্থক হবে, এমতাবস্থায় কোন পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিজেকে জনগণের সামনে পেশ করা এবং কি ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে তা বুঝিয়ে দেয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বাণী স্মরণ করা যেতে পারে। মিসরের সংকটকালে হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেনঃ

ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর দায়িত্ব দিন। আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।" (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লোভ ছিল এ কথা কেউ বলতে পারে না। তিনি শুধু অবস্থার প্রেক্ষিতে কথাটা বলেছিলেন।

যা হোক বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায়ও নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়ার দরকার করে না ; দলীয় ব্যবস্থায় নিজে প্রার্থী হওয়ার প্রয়োজন নেই। দলই সঠিক আদর্শবাদী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করে জনগণের সম্মুখে দাঁড় করাবে। এতে পদপ্রার্থী হওয়ার লোভ সংক্রান্ত সুন্নাহর নিষেধাজ্ঞা এড়ান যাবে। জনগণ প্রার্থীদের সম্পর্কে অবহিত হয়ে যোগ্যতম প্রার্থীকে ভোট দেবে।

ডঃ আবদুল করিম যায়দান বলেন: "বর্তমান সময়ে যেমন প্রার্থী হওয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিতে পারে, তেমনি নিছক ব্যক্তিগত প্রার্থী হওয়ার পথ থেকে দূরে থাকাও সম্ভব হতে পরে। তার উপায় হল দলীয় ভিত্তিতে প্রার্থী দাঁড় করানোর নীতি অনুসরণ। এতে করে যেমন ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়া সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিষেধকে মান্য করা যায়, তেমনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আদর্শও অনুসৃত হতে পারে।"

ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা নির্বাচন

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে মজলিসে শূরা, মজলিসে আম এবং মজলিসে খাস নামে তিনটি পরামর্শ সভা ছিল। বর্তমান যুগেও একটি ইসলামী রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকতে পারে। দ্বিকক্ষের এক কক্ষ হবে মজলিসে শূরা, অপর কক্ষ হবে মজলিসে আম। এছাড়া সরকার প্রধানের একটি মন্ত্রী সভা থাকবে, যাকে মজলিসে খাস বলা যায়।

মজলিসে শূরার নির্বাচন

মজলিসে শূরার সদস্যগণের গুণাবলীর বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নির্ধারিত গুণবিশিষ্ট দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারগণ নির্বাচিত করবেন। বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর পদে যোগ্যতার বিষয়বস্তু জনগণকে জানিয়ে দেয়া, এর বেশী কিছু নয়। জনগণ ইচ্ছা মাফিক যে কোন প্রার্থীকে ভোট দেবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মজলিসে শূরার সদস্যদের জন্য যে বিশেষ গুণাবলীর কথা বিশ্ব নবী (স) বলেছেন এসব গুণাবলী বর্তমান নেই এমন কোন প্রার্থীকে কোন দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে না এবং জনগণও এমন প্রার্থীকে ভোট দেবে না। মজলিসে শূরার নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে।

মজলিসে আম-এর নির্বাচন

মজলিসে আম-এর নির্বাচন ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এই মজলিসে আমের সদস্য মুসলিম অমুসলিম সকলের মধ্য থেকে হবে। এখানেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রয়োজনবোধে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাও চালু করা যায়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মজলিসে আম-এর নির্বাচনে যদি মুসলিমদের সংখ্যা লঘিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে যুক্ত নির্বাচনের পরিবর্তে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত। অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করবে এবং শরীআত বিরোধী কোন কথা বলবে না। মজলিসে আমে শরীআত সংক্রান্ত কোন আইন প্রণীত হবে না বা তা আলোচনায়ও আসবে না। এ ধরনের আইন প্রণয়নের অধিকার মজলিসে শূরারই থাকবে। তবে প্রণীত আইনে কারও কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য মজলিসে শূরার খসড়া বিলটি মতামতের জন্য মজলিসে আমে প্রেরণ করা যাবে।

শরীআতের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই এমন আইন প্রণয়ন এবং এ বিষয় পরামর্শদানই হবে মজলিসে খাসের দায়িত্ব। প্রয়োজন বোধে মজলিসে আম থেকে বা বাইরের থেকে মজলিসে খাসের সদস্য নির্বাচন করা যায়। মজলিসে খাসের সদস্যগণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করবেন। তাদের পরামর্শের জন্য মজলিসে শূরা সরকার প্রধানের কাছে দায়ী থাকবেন।

ব্যবহারিক অর্থে রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন কর্তৃত্ব যার হাতে ন্যস্ত তিনিই সরকার প্রধান। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করা হবে এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কথা উল্লেখ করা গেলেও প্রধানমন্ত্রী যে এ ক্ষমতা লাভ করতে পারেন না এরূপ কথা ইসলামে নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এককথায় উত্তর দিন-

১. প্রত্যক্ষ নির্বাচক কারা?
২. রাষ্ট্র প্রধান, মজলিশে শূরা অথবা আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ কোন প্রকার নির্বাচক?
৩. মদীনা সনদের ভিত্তিতে কি গঠিত হয়?
৪. মদীনার নগর রাষ্ট্রটি কোন ধরনের রাষ্ট্র ছিল?
৫. ইসলামী রাষ্ট্রে যারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচচ অধিকারী এবং যাদেরকে অন্য লোকেরা অনুসরণ করে তারা কারা?
৬. ''আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর দায়িত্ব দিন''- এ উক্তিটি কার?
৭. কার আমলে মজলিশে শূরা, মজলিসে আম ও মজলিসে খাস নামে তিনটি পরামর্শ সভা ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচক সম্পর্কে লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরোক্ষ নির্বাচক সম্পর্কে লিখুন।
৩. মজলিসের শূরার সদস্যদের গুণাবলী উল্লেখ করুন।
৪. আহলুল-হাল্লি ওয়াল-আকদ-এর পরিচয় দিন এবং তাদের গুণাবলী লিখুন।

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচনের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

মজলিসে শূরা ও সংসদীয় গণতন্ত্র

পাঠ ঃ ২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ মজলিসে শূরার পরিচয় ও গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ মজলিসে শূরার মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ সংসদীয় গণতন্ত্র কি তার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ◆ ইসলামী রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মজলিসে শূরার পরিচয়

মজলিস মানে সভা, সংস্থা আর 'শূরা' মানে পরামর্শ। সুতরাং মজলিসে শূরা মানে পরামর্শ সভা বা পার্লামেন্ট। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মজলিসে শূরা একটি একাত্মক পার্লামেন্ট (Unitary Parliament)| ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজলিসে শূরা এমন একটি নির্বাচিত সংস্থার নাম যে সংস্থার সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকান্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। মজলিসে শূরা নির্বাচিত হয় রাষ্ট্রের মুসলিম জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, জ্ঞানী-গুণী ও ইসলামী রাজনীতিতে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা পরামর্শ সভার নাম মজলিসে শূরা। খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে মজলিসে শূরার সদস্যরা খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। তবে সর্বসাধারণের কাছে তাঁরা গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

এ সংস্থার প্রত্যেক সদস্যই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারী ছিলেন। এ ধরনের মজলিসে শূরায় কোন দলাদলি থাকতে পারে না। মেজরিটি ও মাইনরিটি তথা সরকারি দল ও বিরোধী দলের কোন সুযোগ এতে নেই।

মজলিসে শূরার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সামনে রেখে সকল ব্যাপারে নিজ নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে। সঠিক মতের সমর্থন ও পক্ষ অবলম্বন এবং ভুল মতের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করাই হল প্রত্যেক সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

ইসলামী গণতন্ত্রে শূরার গঠন

ইসলামের প্রথম যুগে মজলিসে শূরার সদস্যগণ খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে মজলিসে শূরা জনগণের অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেও গঠিত হতে পারে। সদস্যগণকে অধিকাংশ নারী-পুরুষের রায়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে। সবচেয়ে খোদাভীরু, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে। পদলোভী ও অযোগ্যদেরকে এ পদে নির্বাচন করা যাবে না।

ইসলামী গণতন্ত্রে শূরার ধর্মীয় মর্যাদা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যই মজলিসে শূরা গঠন করা ইসলামী রাজনীতির একটি অপরিহার্য কাজ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ "তাদের সকল কাজ পরামর্শভিত্তিক পরিচালিত হয়।" (সূরা আশ-শূরা-৩৮)

তিনি আরও বলেন ঃ "তুমি কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ কর।" (সূরা-আল-ইমরান-১৫৯)

এজন্যই ইসলামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজলিসে শূরা গঠন অপরিহার্য করা হয়েছে। কেননা এটাই হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্রের ভিত্তি।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এ জীবন ব্যবস্থার দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মজলিসে শূরা। আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে এর রয়েছে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো -

সংসদীয় গণতন্ত্র কী

সংসদীয় গণতন্ত্র হলো জবাবদিহিমূলক সরকার। যেখানে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভা শাসন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এ ধরনের সরকারে একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা থাকে মন্ত্রী পরিষদের ওপর। মন্ত্রী পরিষদের একজন প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তাকে সরকার প্রধান বলা হয়।

মজলিসে শূরা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র ও মজলিসে শূরার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। কিছু কিছু বিষয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে মজলিসে শূরার মিল রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে মজলিসে শূরা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

১. **সরকার গঠন পদ্ধতি ঃ** সংসদীয় পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্যরা মন্ত্রিসভার সদস্য হন, যাঁদেরকে নিয়ে সরকার গঠিত হয়। শূরাভিত্তিক সরকারেও সাধারণত শূরার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

২. **আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ঃ** আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। শূরাভিত্তিক সরকারেও মজলিসে শূরা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।
খিলাফতে রাশেদার সময়ে মজলিসে শূরা ও শাসন বিভাগের মধ্যে কোন রূপ মেরুকরণ ছিল না। মজলিসে শূরার সদস্যরাই শাসন বিভাগের সদস্য হতে পারতেন।

৩. **জবাবদিহিতা ঃ** সংসদীয় পদ্ধতিতে মন্ত্রি সভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। শূরাভিত্তিক সরকারেও রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষভাবে শূরার নিকট এবং পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

৪. **পরামর্শভিত্তিক শাসন কার্যক্রম ঃ** আধুনিক সংসদীয় সরকারকে পরামর্শভিত্তিক সরকার বলা হয়। অর্থাৎ সরকার পরামর্শের মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শূরাভিত্তিক সরকারেও রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

৫. **রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ঃ** সংসদীয় গণতন্ত্রে সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। শূরাভিত্তিক সরকারেও মজলিসে শূরার সদস্যদের পরামর্শে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন।

বৈসাদৃশ্যের সম্পর্ক

সার্বভৌম ক্ষমতা

আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে শূরাভিত্তিক সরকারে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে গণ্য করা হয়। যেমন- আল্লাহর ঘোষণা-

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই"। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ

"জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তারই"। (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪)

নির্বাহী ক্ষমতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে নামেমাত্র একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। যিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বহন করেন না ; বরং প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু শূরাভিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

বিরোধী দল

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব আছে। পক্ষান্তরে মজলিসে শূরা একটি একাত্মক পার্লামেন্ট (Unitary Parliament), যার ফলে এখানে সরকারি দল-বিরোধী দল অথবা মেজরিটি মাইনরিটির কোন অস্তিত্ব নেই।

জবাবদিহিতা

সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। পক্ষান্তরে শূরাভিত্তিক সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান সমগ্র জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

আইন প্রণয়ন ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যগণ আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করেন। পক্ষান্তরে শূরাভিত্তিক সরকারে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব মজলিসে শূরার নয়। বরং আইন প্রণীত হয় কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীআত অনুযায়ী। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয়না, তারাই কাফির"। (সূরা আল-মায়েদা : ৪৪)

সারকথা ঃ ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এর কোন সদস্যই বংশীয় আভিজাত্য বা আর্থিক প্রাচুর্য্যের কারণে নির্বাচিত হন না। এ শূরার প্রত্যেক সদস্যই স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারী। এ শূরায় কোন দলাদলি, মেজরিটি ও মাইনরিটির দোহাই দিয়ে কোন আইন পাস হয় না। সদস্যগণ ইসলামের বিধান সামনে রেখে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করবেন। সত্য হলে মানবেন, অসত্য হলে প্রতিবাদ করবেন। সরকার পরিচালনায় এ শূরার ভূমিকা খুবই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নৈর্বাচনিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরা অর্থ হচ্ছে-

ক. ইসলামী গণতন্ত্র; খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুরূপ;
গ. পরামর্শ সভা; ঘ. উচ্চ আদালত।

২. মজলিসে শূরা গঠিত হয়-

ক. জনগণের ভোটের মাধ্যমে; খ. রাজনৈতিকভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে;
গ. রাষ্ট্রের মুসলিম জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে; ঘ. জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির মতামতের মাধ্যমে।

৩. মজলিসে শূরা কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. তিনভাগে; খ. দুইভাগে;
গ. চারভাগে; ঘ. পাঁচভাগে।

৪. শূরা ভিত্তিক সরকারে জবাবদিহিত কার?

ক. প্রেসিডেন্টের; খ. প্রধানমন্ত্রীর;
গ. মন্ত্রীপরিষদের; ঘ. শূরার সদস্যদের।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন-

ক. মজলিসে শূরা; খ. পার্লামেন্ট;
গ. প্রধানমন্ত্রী; ঘ. আল্লাহ তাআলা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরা বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
২. মজলিসে শূরার গঠন প্রণালী আলোচনা করুন।
৩. সংসদীয় গণতন্ত্র কী? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরা কী ? মজলিসে শূরার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২. সংসদীয় গণতন্ত্র ও মজলিসে শূরার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

পাঠ ঃ ৩ মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- মজলিসে শূরার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মজলিসে শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত ও পরিচালিত হয়। মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের অপরিহার্য একটি মৌলিক উপাদান। মজলিসে শূরা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র বা গণতন্ত্র কল্পনাই করা যায় না। কাজেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মজলিসে শূরা এমন এক সংস্থার নাম, যে সংস্থার সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকান্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একে একটি একাত্ম পার্লামেন্ট (Unitary Parliament) বলা হয়। ইসলামী বিধানে পারদর্শী ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নির্বাচিত ও সুসংঘবদ্ধ একাত্মক ব্যবস্থা বলে এর সদস্যগণের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ও সত্য প্রকাশের অধিকারী। এ ধরনের মজলিসে শূরায় কোন দলাদলি নেই। মেজরিটি আর মাইনরিটি তথা সরকারি দল ও বিরোধী দল কিংবা মজুর-কৃষক ও ধনী-গরিবের কোন স্থায়ী দলবাজের অবকাশ এতে নেই। মজলিসে শূরার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সম্মুখে রেখে সকল ব্যাপারে নিজ নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেন। সত্য মতের সমর্থন এবং ভুল ও অন্যায় মতের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করাই হবে প্রত্যেক সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও গুণাবলী

কুরআনের আলোকে মজলিসে শূরার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হতে হবে। জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত, আন্তরিক, নিষ্ঠাবান ও কল্যাণকামী হতে হবে। আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। আমানতদার ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা জাতীয় আদর্শ ব্যাহত হবে। ক্ষুণ্ন হবে সার্বিক কল্যাণ, সারা দেশে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং জাতি ও রাষ্ট্র ধ্বংসে পতিত হবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক বা কর্মচারীকে ও কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্ত হতে হয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلأَمِينُ

"তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সূরা আল-কাসাস : ২৬)

মজলিসে শু'রার সদস্যকেও যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে আরও ব্যাপকভাবে কাম্য।

মজলিসে শূরার উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন উদঘাটন করা এবং ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এজন্য শূরা সদস্যদের- অন্তত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের কুরআন-সুন্নাহ'য় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।" (সূরা আন-নাহল : ৪৩)

মজলিসে শূরার কাজ হচ্ছে জাতীয়, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের সকল বিষয়ে কুরাআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী আইন প্রণয়ণ করা আর শূরার সদস্যদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিকভাবে গবেষণার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। আয়াতের

'আহলুয-যিকর' অর্থ 'আহলুল ইলম'-কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান-এর অধিকারী। রাসূল (স.)-এর মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছিলেন সাহাবা কিরাম। তাঁরা সকলেই বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

রাসূলে করীম (স.) কুরআন ও সুন্নাহ-এর শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক লোক তৈরী করেছিলেন। রাসূলে করীম (স.)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগে এ ধরনের লোক নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায়ও এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কুরআন-সুন্নাহ সামনে নিয়ে গভীর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয় আইন উদ্ভাবন করতে সক্ষম। অন্যথায় নিত্য পরিবর্তনশীল সংঘটিত ঘটনা ও বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইসলামসম্মত আইন ধারাবদ্ধ করা মজলিসে শূরার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার ভূমিকা

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও এর প্রকৃতি পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে ইসলামী গণতন্ত্র সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী গণতন্ত্র এমন গণতন্ত্র যেখানে কোন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না। সেখানে কেউ পদপ্রার্থী হতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে- "যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসাতে হবে।"

ইসলামী গণতন্ত্রের পরিভাষায় সংসদকে বলা হয় মজলিসে শূরা। মজলিসে শূরা দু'ভাগে বিভক্ত-

১. মজলিসে আম ঃ এটা সাধারণ পরিষদ বা নিম্ন পরিষদ। এতে অধিকাংশ জনগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. মজলিসে খাসঃ এটা উচ্চ পরিষদ। এখানে রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনরা থাকেন।

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিশে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ-

পরামর্শদান

কুরআন ও হাদীসের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতির ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শদানই হল মজলিসে শূরার প্রধান কাজ।

রাষ্ট্র পরিচালনা

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন এবং পরামর্শ প্রদান করাও মজলিসে শূরার কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে শূরাকেই বহন করতে হয়।

আইন প্রণয়ন

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার উপর বড় দায়িত্ব হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন বের করা ও ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এ জন্য শূরার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যকেই কুরআন, সুন্নাহয় জ্ঞানী ও পারদর্শী হতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ "তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা নাহল-৪৩)

কাজেই ইসলামী আইনের উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর শূরার সদস্যদের ইজতিহাদী (গবেষণার) যোগ্যতা থাকতে হবে।

মহানবী (সাঃ)-এ সম্পর্কে বলেন, "তোমরা কুরআন-সুন্নাহয় পারদর্শী মুমিন লোকদের একত্র কর।" অতঃপর তাদের নিয়ে শূরা গঠন কর। তবে তাদের কোন এক জনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।" (সুনানে আবু দাউদ)

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক গণতন্ত্রে সংসদের মত ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। বরং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বর্ণিত আইনকে বের করা ও প্রয়োগ করাই মজলিসে শূরার কর্তব্য।

যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সিদ্ধান্তগ্রহণ

ইসলামী গণতন্ত্রে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূমি, রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ, বদলি, যুদ্ধাভিযান পরিচালনা, খলীফা ও সরকার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ, কর-আরোপ,

শাসনকার্য পরিচালনা ইত্যাকার যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড মজলিস শূরার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হতে হবে।

অনুমোদন

রাষ্ট্রপ্রধানের বিভিন্ন কার্য ও মতামত মজলিসে শূরার অনুমোদন নিয়ে সম্পাদন করতে হয়।

জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ

ইসলামী গণতন্ত্রে সামষ্টিক ও জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে ও কর্মসূচি গ্রহণে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে শূরার অনুমোদন ছাড়া কিছু করা যায় না।

গঠনতন্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যাদান

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার ভূমিকার মধ্যে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান ও প্রণীত আইনের ব্যাখ্যাদান করা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

আর্থিক অডিটঃ বায়তুলমালসহ যাবতীয় আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করাও শূরার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

অধিবেশনসমূহের কার্যপ্রণালী প্রণয়নঃ মজলিসে শূরার অধিবেশনসমূহের কার্যাবলীর নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করা ও তা বাস্তবায়নে সাহায্য করা ও শূরার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান অনুযায়ী জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করাও শূরার কর্তব্য।

সৎ কাজে সাহায্য করা

সকল সৎ কাজে রাষ্ট্রপ্রধানকে সাহায্য করা শূরার অপরিহার্য কর্তব্য। "খলীফাগণ আমাদের মতই। যতক্ষণ তিনি আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ করবেন, ততক্ষণ আমরাও তাঁর অনুসরণ করব, অন্যথায় নয়।"

অন্যায় কাজ প্রতিরোধ

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে অন্যায় ও পাপের কাজে খলীফাকে পরামর্শ প্রদান বা সাহায্য করা যাবে না। বরং তা প্রতিরোধ করতে হবে। শরীআতের সীমালঙ্ঘন হয় এমন কোন কাজে তাকে সাহায্য করা যাবে না।

সারকথাঃ ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এর কোন সদস্যই বংশীয় আভিজাত্য বা আর্থিক প্রাচুর্য্যের কারণে নির্বাচিত হন না। এ শূরার প্রত্যেক সদস্যই স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবিদার। এ শূরায় কোন দলাদলি, গ্রুপিং, মেজরিটি ও মাইনরিটির দোহাই দিয়ে কোন আইন পাস হয় না। সদস্যগণ ইসলামের বিধান সামনে রেখে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করবে। সত্য হলে মানবে, অসত্য হলে প্রতিরোধ করবে। সরকার পরিচালনায় এ শূরার ভূমিকা খুবই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নৈর্বাচনিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরা অর্থ হচ্ছে-
ক. ইসলামী গণতন্ত্র; খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুরূপ;
গ. পরামর্শ সভা; ঘ. উচ্চ আদালত।

২. কোন গণতন্ত্রে কোন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না?
ক. মৌলিক গণতন্ত্রে; খ. প্রাচ্যের গণতন্ত্রে;
গ. সংসদীয় গণতন্ত্রে; ঘ. ইসলামী গণতন্ত্রে।

৩. ইসলামী গণতন্ত্রে সংসদকে বলা হয়-
ক. পার্লামেন্ট; খ. মজলিসে শূরা;
গ. মজলিসে খাস; ঘ. মজলিসে আম।

৪. কোন তন্ত্রে কোন প্রার্থী হতে পারে না?
ক. রাজতন্ত্রে; খ. সমাজতন্ত্রে;
গ. ধনতন্ত্রে; ঘ. ইসলামী তন্ত্রে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরার পরিচয় দিন।
২. মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৩. মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী ও দায়িত ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ একনায়কতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন;
- ◆ রাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করতে পারবেন;
- ◆ পশ্চিমাগণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরতে পারবেন।

ইসলাম একটি চিরন্তন শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক পরিচালনার যে সুন্দরতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, তা অনন্য ও সর্বজনীন। এ সকল পদ্ধতির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। নিম্নে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে তার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একটি অনন্য রাজনৈতিক পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে বহুবিধ রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি কোন মানুষের চিন্তা বা গবেষণার ফসল নয়। বরং তা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের দেওয়া পদ্ধতি। আল্লাহ যেভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তাই বাস্তবায়ন করা হয়। ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে এসেছে

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

"বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা-ইউসুফ : ৪০)

আল্লাহর দেওয়া দিকনির্দেশনার আলোকে মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে অনৈসলামিক বা মানব রচিত কোন আদর্শবাদ স্থান পাবে না। সম্পূর্ণ ইসলামের আলোকে পরিচালিত যে রাজনৈতিক পদ্ধতি, তাই-ই-হলো ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি।
মহান আল্লাহ বলেন,

ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً

"তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২০৮)

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনামুলক আলোচনা

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যার সাথে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতির কোথাও কোথাও মিল রয়েছে আবার কোথাও কোথাও রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। নিম্নে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হলো-

একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম

আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একনায়কতন্ত্র একটি অন্যতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়কের হাতেই সর্বময় ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে। জনগণের অধিকার ও বক্তব্য সেখানে অবহেলিত। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একনায়ক কেন্দ্রিক নয়। সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে পরামর্শ সভা গঠিত হয়, তার সাথে পরামর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ

''কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অত:পর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।'' (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

আর এ পদ্ধতিতেই রাজনীতি গণমুখী হবে এবং জনগণ স্বতঃস্ফ র্তভাবে তা গ্রহণ করবে।

রাজতন্ত্র ও ইসলাম

বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। এ পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাষ্ট্রনায়কের পর তার পরবর্তী রাষ্ট্রনায়ক উক্ত পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই মনোনীত হয়, চাই সে যোগ্য হোক বা না হোক। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রনায়ক না করে রাজপরিবারের বা রাজবংশের একজনকেই রাষ্ট্রনায়ক করা হয়। আর সে রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাজনীতি পরিচালিত হয়। কিন্তু ইসলাম এ পদ্ধতি সমর্থন করে না। যোগ্যতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হবে। আর সকলকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। সে অতি নগণ্য পরিবারেরও যদি হয়, তবুও যোগ্যতার ভিত্তিতে সে-ই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (স) হাদীসে ঘোষণা করেন ঃ "যদি নাক কাটা হাবশী তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবুও তোমরা কোন বংশ মর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।" তাই দেখা যায়, রাজতন্ত্রের চেয়ে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি অনেক উন্নত এবং কজনকল্যাণমূলক।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম

বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাজনৈতিক পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করছে। সংখ্যালঘুরা আইনের অধিকারে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাতে বাধা প্রদান করে। ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইসলামের যে রাজনৈতিক পদ্ধতি রয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের কোন প্রশ্ন নেই। সকলেরই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। সংখ্যালঘুদের জান-মাল ইসলামী রাষ্ট্রের আমানতস্বরূপ। ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করার কোন সুযোগ দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকলেরই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সমান।

সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষের আত্মার বন্দীশালা। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের স্বাধীন সত্তা থাকে না। জনসাধারণকে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। আর কর্তা ব্যক্তিরা তাদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে। সেখানে কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না । থাকে না ন্যায্য কথা বলার কোন অধিকার। ব্যক্তি মালিকানা ও পারিবারিক পদ্ধতিকে বাজেয়াপ্ত করে সবকিছুকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং কর্তা ব্যক্তিরা তা ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের কেবল শ্রমের অধিকার রয়েছে। স্বাধীনভাবে তা ভোগ করার অধিকার নেই। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার দেয়। ব্যক্তি ও পরিবারের স্বীকৃতি দিয়ে সুখী সমৃদ্ধ সুখময় সমাজ গড়ার সুযোগ করে দেয়। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, ''সমাজতন্ত্র সে তো মানবাত্মার বন্দীশালা''।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলাম

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিল থাকলেও বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের সমর্থনই বিবেচ্য। জনগণ একজন অযোগ্য লোককেও নির্বাচিত করলে সেই রাষ্ট্রপ্রধান হবে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল যোগ্যতার পাশাপাশি তাকওয়া বা খোদাভীতিকে সামনে রেখে রাষ্ট্রপ্রধানের পদের জন্য মনোনয়ন দেয় এবং জনগণ তাকে ভোট প্রদান করে তার প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে সরকার জাতীয় পরিষদের মতানুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে ; কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোন মত প্রকাশ করলে তা গৃহীত হবে না।

সারকথাঃ ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনের যে সুন্দর সমাধান দিয়েছে, তা আর কোন জীবনব্যবস্থা দিতে পারেনি। ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি অন্য সকল রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে উন্নত ও বাস্তবমুখী। এর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক সমস্যার সুন্দর সমাধান সম্ভব। ইসলাম একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সমাজতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের চেয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা উত্তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সার্বভৌম ক্ষমতা-

ক. একমাত্র আল্লাহর হাতে; খ. মানুষের হাতে;
গ. কিছু আল্লাহর হাতে কিছু মানুষের হাতে; ঘ. সরকারের হাতে।

২. কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়কের কাছে সর্বময় ক্ষমতার চাবিকাঠি-

ক. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; খ. সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে;
গ. ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে; গ. একনায়কতন্ত্র পদ্ধতিতে।

৩. কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পরামর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?

ক. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; খ. ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে;
গ. ইসলামিক পদ্ধতিতে; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৪. কোন মতবাদ স্বাধীন মানুষের আত্মার বন্দীশালা

ক. একনায়কতান্ত্রিক মতবাদ; খ. সমাজতান্ত্রিক মতবাদ;
গ. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ; ঘ. ইসলামী জীবনাদর্শ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম এর মধ্যে তুলনা করুন।
২. রাজতন্ত্র ও ইসলাম এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম এর মধ্যে তুলনা করুন।
৪. সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
৫. গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য লিপিবদ্ধ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকার পদ্ধতির তুলনা

পাঠ ঃ ৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন;
- আধুনিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন;
- ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

ইসলামী সরকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার যা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। বর্তমান বিশ্বে যে সব সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা তার মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণমুখী। তাই আধুনিক ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সাথে এর বহুবিধ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ইসলামী সরকারের সাথে আধুনিক সরকারের তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল।

ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকারের পার্থক্যসমূহ

সংজ্ঞাগত পার্থক্য

যে সরকার আল্লাহর বিধি-বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাকে ইসলামী সরকার বলে। অপরদিকে যে সরকার মানবরচিত আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাকে আধুনিক সরকার বলা হয়। আধুনিক সরকার পদ্ধতির মধ্যে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র বা একনায়কতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি অন্যতম।

দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য

ইসলামী সরকার উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্রভিত্তিক সরকার নয়, সবার স্বার্থ নিয়ে এ সরকার কথা বলে। পক্ষান্তরে আধুনিক সরকার নির্দিষ্ট দেশ, জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্রভিত্তিক সরকার। এ সরকার নির্দিষ্ট একটি জাতি, সম্প্রদায় বা গোত্রের স্বার্থ নিয়ে ভাবে।

ক্ষমতার উৎসগত পার্থক্য

ইসলামী সরকারের ক্ষমতার উৎস কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, এখানে সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। ইসলামী সরকার আল্লাহর আইনকে কার্যকর করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ। যেমন- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠনকে ক্ষমতার উৎস বলা হয় এবং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা হয় জনগণকে।

নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য

ইসলামী সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য প্রার্থী হতে পারে না। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত হন অথবা জনপ্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হবার জন্য যে কোন যোগ্য নাগরিক নিজের যোগ্যতা দাবি করে উক্ত পদের প্রার্থী হতে পারেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

ইসলামী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দকে মুসলিম, সৎ, খোদাভীরূ শারীরিক ও জ্ঞানগতভাবে যোগ্য হতে হয়। কুরআনে এসেছে-

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ

''তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।'' (সূরা আল-বাকারা : ২৪৭)

অন্যথায় জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। অপরদিকে আধুনিক সরকারপ্রধান ও আইনসভার সদস্যদের জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে তিনিই এপদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন, জ্ঞান বা শারীরিক যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা এতে নেই।

কাঠামোগত পার্থক্য

ইসলামী সরকারে মহিলাদের দেশরক্ষা, প্রশাসন ও অন্যান্য কঠিন দায়িত্বে নিয়োগ না করার বিধান আছে। দেশ ও ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষগণ অসমর্থ হলে মহিলাদের কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আধুনিক সরকারের সকল পর্যায়ে মহিলাদের নিয়োগদানে কোন সমস্যা নেই।

ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে

ইসলামী সরকার ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করে। আর আধুনিক সরকারের মতে, ধর্ম ও রাজনীতি এক নয়। রাজনীতি থেকে তারা ধর্মকে পৃথক করে রাখে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার দেশের অক্ষম, দরিদ্র, অনাথ, বৃদ্ধ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব পালনে বাধ্য। ব্যক্তির পুঁজি বিনিয়োগের স্বাধীনতা থাকলেও এখানে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার সুযোগ নেই। কিন্তু আধুনিক ধনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজির শোষণ বিদ্যমান। এরা খোলাবাজার অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাত-কাপড়ের কথিত নিশ্চয়তা প্রদান করে। কিন্তু স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় কুরআন ও হাদীসের আইন অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার ফয়সালা করা হয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় মানব রচিত তথা নিজস্ব রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা অপরাধের বিচার করা হয়।

জবাবদিহিতা

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে সৎ, ধর্মভীরু ও পরকালে বিশ্বাসী, সর্বোপরি আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু আধুনিক সরকারব্যবস্থায় এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

সংবিধান পরিবর্তনের দিক থেকে পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। এমনকি মজলিসে শূরার সকল সদস্য একত্র হয়েও সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা এই সংবিধানের রচয়িতা মহান আল্লাহর ও তাঁর প্রিয় রাসূল (স)। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতিতে এমনটি নেই। সেখানে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য ইচ্ছে করলেই সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন।

সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে

ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। এখানে জনগণের ক্ষমতা সীমিত। সরকারপ্রধানকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার পরিচালনা করতে হয়। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং জনগণই ক্ষমতার একমাত্র উৎস।

আইনসভার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা বা মজলিসে শূরা নতুন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। বরং শরীআতের সাথে সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ উপযোগিতা নির্ণয় করতে পারে মাত্র। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের ভিত্তিতে শরীয়তবিরোধী কোন আইন গঠিত হতে পারে না। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা আইনসভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সরকারপ্রধানের ক্ষমতা

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান শরীয়া বিরোধী যে কোন বিলে ভেটো প্রদান করতে পারেন। তবে শরীয়াতসম্মত জনকল্যাণমূলক কোন বিলে তিনি ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারব্যবস্থায় সরকারপ্রধান নিজস্ব বিবেচনায় যে কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন।

আইনের উৎস

ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস হল ইসলামী শরীয়া বা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এখানে মানব রচিত মতবাদের কোন স্থান নেই। সংসদে শূরার সদস্যগণ শরীয়ার ভিত্তিতেই আইন প্রণয়ন করে থাকেন। আর আধুনিক সরকারব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সেজন্য তাদের রচিত আইন হল আইনের উৎস।

সারকথাঃ বর্তমান পৃথিবীতে যেসব সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে ইসলামী সরকার ব্যবস্থাই সর্বাধিক যুগোপযোগী ও জনগণের জন্য অধিক কল্যাণকর। তাই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে হলে ইসলামী সরকারের কোন বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে

ক. আল্লাহর বিধি-বিধান মোতাবেক; খ. কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালনা করে;
গ. মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনা করে; ঘ. ক ও খ উত্তর সঠিক।

২. ইসলামী সরকার-

ক. সম্প্রদায় ভিত্তিক সরকার; খ. নির্দিষ্ট দেশ ভিত্তিক সরকার;
গ. শ্রেণী ভিত্তিক সরকার; ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৩. ইসলামী সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান-

ক. যে কোন লোক হতে পারেন; খ. শুধু মুসলিম হলেই চলে;
গ. অমুসলিম যোগ্য ও সৎ হলেও চলে; ঘ. মুসলিম, সৎ ও যোগ্য হতে হয়।

৪. আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়-

ক. আধুনিক সরকার ব্যবস্থায়; খ. ইসলামী সরকার ব্যবস্থায়;
গ. উভয় ব্যবস্থায়; ঘ. শুধু ধনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়।

৫. কোন সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার মালিক জনগণ-

ক. ইসলামী সরকার ব্যবস্থায়; খ. পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়;
গ. সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়; ঘ. খ ও গ উভয় উত্তর সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে লিখুন।
২. আধুনিক সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী সরকার ব্যবস্থায় আইনের উৎস কয়টি ও কি কি?
৪. ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকারব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্যগুলো লিখুন।
৫. ইসলামী ও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য লিখুন।

বিশদ উত্তরপ্রশ্ন

১. ইসলামী সরকার ও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করুন।

পাঠ ঃ ৬

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরার গুরুত্ব বর্ণনা কতে পারবেন;
- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান -এর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কারা মুসলিম জনগণের নেতা হতে পারবেন না তাদের সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ইসলামী শরীআত মোতাবিক গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান-এর গুরুত্ব ও ভূমিকা অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন প্রকৃতির। যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য ফরয। এ কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান-এর মধ্যে কতকগুলো আইনগত এবং চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর যার মধ্যে এ সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান থাকবে, জনগণ তাকেই আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করবে। তিনি জনগণের রায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক যোগ্য ও নীতিবান ব্যক্তিবর্গকে মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত করবেন। আর তাদের পরামর্শক্রমে শরীআত মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান-এর আইনগত গুণাবলী

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান-এর নিম্নবর্ণিত আইনগত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

মুসলিম হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের এ পদের উপযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ .

"হে মুমিনগণ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

এখানে তোমাদের মধ্য হতে, কথাটি প্রমাণ করে তাকে মুসলিম হতে হবে।

পুরুষ হওয়া ঃ রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। কোন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। মহানবী (সা)-এ মর্মে বলেন-

لن يفلح قوم و لوا أمرهم امراة .

"যে জাতি কোন মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, সে জাতি কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না।"

এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা-

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ.

"পরুষ নারীর কর্তা।" (সূরা আন-নিসা : ৩৪)

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ঃ উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না।

সুস্থ হওয়া ঃ অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত নয়।

বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া ঃ উক্ত গুরুত্বপুর্ণ পদের জন্য বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবেক-বুদ্ধিহীন, পাগল ও নির্বোধ লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান করা যাবে না। কুরআন বলছে-

وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ .

"তোমাদের সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে অর্পন করো না।" (সূরা আন-নিসা : ৫)

স্থায়ী অধিবাসী হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হবেন। অস্থায়ী কোন বাসিন্দাকে রাষ্ট্রের প্রধান করা যাবে না।

রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে হলে, অবশ্যই তাকে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নন। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী- "যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি, হিজরত করে নাগরিক না হওয়া পর্যন্ত ওয়ালী বা নেতৃত্বের কোন অধিকার তাদের নেই।"

চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে হলে আইনগত গুণাবলীর পাশাপাশি কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

তাকওয়ার ও নৈতিকতার অধিকারী হওয়া ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য ব্যক্তিকে তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহভীরু ও পরহেযগার লোক হতে হবে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ .

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)

আমানতদার ও আস্থাভাজন হওয়া ঃ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য সততার অধিকারী, আমানতদার ও জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে। বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী কখনও উক্ত পদের উপযুক্ত নয়। এ মর্মে আল্লাহর বাণী-

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا .

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদের কাছে পৌছে দিতে।" (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া ঃ এ পদের জন্য বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভাবনী ও বিশে- ষণ শক্তি, গভীর জ্ঞান প্রভৃতি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। নচেৎ রাষ্ট্রীয় জটিলতা ও সমস্যামূলক কার্যাবলী সমাধান করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হাদীসে এসেছে-

إذا وسد الأمرإلي غير أهله فانتظرالساعة.

"যখন অযোগ্য লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো করা হয় তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে"। (বুখারী, ইলম অধ্যায়)

জ্ঞানের পাশাপাশি শারীরিক যোগ্যতা ঃ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্যবান মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই উক্ত পদের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ .

"তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৪৭)

পদলোভী না হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যেহেতু সমাজের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের অধিকারী বলে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাই কেউ এখানে পদপ্রার্থী বা পদলোভী হতে পারবে না। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, তদ্বির, প্রচার ও অর্থ ব্যয় করা এ পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা জনগণই নৈতিক মান দেখে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করবেন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- "আল্লাহর শপথ ! এমন কাউকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যাবে না, যে ব্যক্তি নিজেই তা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয়।"

অর্থলোভী না হওয়া ঃ রাষ্ট্রপ্রধান-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই অর্থ-সম্পদের প্রতি লোভহীন হতে হবে। অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে তাকে নির্বাচিত করা যাবে না। কারণ এ লোভের কারণে সে রাষ্ট্রীয় সম্পদের তসরূপ করতে পারে।

আল্লাহকে সর্বদা স্মরণকারী হওয়া ঃ এ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য আল্লাহকে সদা স্মরণকারী হওয়া আবশ্যক। কখনও তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণশূন্য হতে পারবে না। কেননা আল্লাহর স্মরণশূন্য হৃদয় যার, তার দ্বারা যে কোন অন্যায়, অনাচার হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহর হুশিয়ারী-

وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا .

"তুমি তার আনুগত্য করোনা -যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি।" (সূরা আল-কাহফ: ২৮)

বিদআতপন্থী না হওয়া ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে রাসূলের সুন্নাহ পরিপন্থী কোন বিদআতী বা কুসংস্কার পন্থী কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যাবে না। কেননা এ জাতীয় লোক দ্বারা কখনো ইসলাম বা মানবতার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না ; বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মহানবী (স) তাই বলেছেন, "ইসলামের নামে সকল কুসংস্কার পথ ভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য ।"

ন্যায়বিচারক হওয়া ঃ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই ন্যায়বিচারক হতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা-
"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে ।" (সূরা আন-নিসা : ৫৮)

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা ও প্রতিভা ঃ প্রশাসনিক কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পালনের জন্য তার স্বভাবগত যোগ্যতা একান্তই অপরিহার্য। নেতৃত্বদান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা। কেননা মানুষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শাসকদের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা বিশ্ব জাতিসমূহের বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে, জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে চরম দুর্গতি ও দুর্ভোগ। প্রশাসকের এই গুণ থাকার শর্তটির গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তা প্রমাণের জন্য কোন দলীল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না। নেতৃত্ব স্বতঃই এই শর্তের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। নবী কারীম (স) নিজে এই শর্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেন-

لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : روع يحجزه عن معاصى الله . و حلم يملك به غضبه . و حسن الولاية على من يلى حتى يكون كالولد .

"নেতৃত্বদানের জন্য কেবল সেই পুরুষই উপযোগী যার মধ্যে এ তিনটি স্বভাব রয়েছে-

- এমন আল্লাহ ভীতি যা তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখে।
- এমন ধৈর্য-সহ্য যা দ্বারা সে তার ক্রোধ আয়ত্তে রাখতে পারে ।
- সে যাদের নেতৃত্ব দেবে তাদের উপর উত্তম নেতৃত্ব দান করবে যেন তারা সবাই তার সন্তান তুল্য হয়ে যায়।"

মুসলিম জনগণের নেতা এমন ব্যক্তি হতে পারেন- যিনি উদারতা, সহনশীলতা ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হবেন।

বস্তুত উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান সেই রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ এবং খোদাভীরু, আমানতদার, সুবিচারক ও নিঃস্বার্থবাদী মানুষ হতে হবে। অর্থাৎ উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার উপযুক্ত। তার আনুগত্য সানন্দে স্বীকার করতঃ সর্বাবস্থায় তারা আনুগত্য করা সকলের উপর ফরয। আর এটাই হলো একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী-

ক. রাষ্ট্রপ্রধান
খ. মজলিসে শূরা;
গ. প্রধানমন্ত্রী;
ঘ. আল্লাহ তাআলা।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত গুণাবলীর একটি হচেছ-

ক. মুসলিম হওয়া;
খ. আস্তিক হওয়া;
গ. বয়স্ক হওয়া;
ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৩. রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য তাকে

ক. অবশ্যই সকল চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে;
খ. কিছু গুণের অধিকারী হলেও চলবে;
গ. মূর্খ হলেও চলবে;
ঘ. উপরের সবকটি উত্তর ঠিক।

৪. রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য শারীরিক যোগ্যতা-

ক. অপরিহার্য;
খ.আবশ্যক নয়;
গ. থাকা ভালো;
ঘ. না থাকলে কোন অসুবিধা নেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত গুণাবলী সংক্ষেপ লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের চারিত্রিক গুণাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলী বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৭

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ◆ কুরআন-হাদীসের আলোকে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরকে পদচ্যুত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আইন জারী ও কার্যকর করার জন্য একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মুসলিম জনগণের মধ্য হতে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। আমীর জনগণের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক হন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব পাবার কোন অধিকারই তার নেই। সকল মানুষের মধ্যে কেবল তাকেই খলীফা বা আমীর নামে অভিহিত করা হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কেবল তিনিই খলীফা অন্য কেউ নয়। বরং তার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ নিজ নিজ খিলাফত অধিকার তার নিকট আমানত রেখেছে মাত্র। কারণ, প্রত্যেকেই আল্লাহর খলীফা, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে খলীফাতুল মুসলিমীন' বলার এটাই তাৎপর্য। কারণ এটা ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা একেবারেই সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্রপ্রধান বা খিলাফতের মর্যাদায় যাকে অধিষ্ঠিত করা হবে তার কাজ সাধারণ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে ভিন্নতর। এ মর্যাদা হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরীআত প্রদত্ত একটি মর্যাদা। শরীআত তার অসংখ্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মর্যাদাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হবে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। এ উদ্দেশ্যকে এক কথায় ব্যক্ত করতে গেলে বলা যায়, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআনের উদ্ধৃতি ও মহানবী (সা.) -এর বাণী থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়।

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً .

"তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাঁর পছন্দনীয় দীন প্রতিষ্ঠা করবেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তাদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।" (সূরা আন-নূর : ৫৫)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করা, দ্বীনের মান-মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সেখানকার জনগণের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতি ও বিপদ আশংকা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে স্বাধীন নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের সুযোগ করে দেয়া। আর এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানই এসব কাজ করার জন্য দায়িত্বশীল।

মহানবী (স) বলেন ঃ

إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه

"যদি এমন কোন ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার অংগ কেটে দেয়া হয়েছে; কিন্তু সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তোমাদের পরিচালনা করছে, তা হলে তার কথা শ্রবণ করো ও তাঁর আনুগত্য করো।" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারত)

মূলত খিলাফতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে-

هى خلافة الرسول فى إقامة الدين .

"খিলাফত হলো দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) -এর উত্তরাধিকারিত্ব।"(কিতাবুল মাওয়াকিফ)

দ্বীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো মুসলিম সমাজকে সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি ঃ খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের বৈষয়িক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা এবং তাদের পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করে। ইসলামী ফিকহবিদগণ খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব হিসেবে দুটো কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে কার্যকর ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের আইন বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসলামের রীতি-নীতি অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। এক কথায় বলা যায়, দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কারণে ফিকহবিদগণ খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাষায়-

"ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত হল, মহানবী (স) থেকে অনুমোদিত দ্বীন ও দুনিয়ার সামগ্রিক বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান।"

إنها خلافة الرسول في إقامة الدين و حفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة

"দ্বীন কায়েম করা ও মুসলিম মিল্লাতের আদর্শ ও মান রক্ষা করার কাজে রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করা। একারণেই তার অনুসরণ করা সমগ্র উম্মতের কর্তব্য।'' (মাওয়াফিক-৩৩)

আল্লামা মাওয়ার্দী খিলাফতের সংজ্ঞায় বলেন ঃ

إنها موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا .

"দ্বীনের হেফাজত, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা নবুওয়াতের প্রতনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত।"(আল-আহকামু আস-সুলতানিয়্যাহ)

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ রাষ্ট্র প্রধান বা খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিরাট তেমনি মহান। প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ করা। আল্লাহর খিলাফতের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দ্বীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা, দ্বীনের মর্যাদা, ঐতিহ্য-আদর্শ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আর এ কাজের জন্য প্রধান দায়িত্বশীল হচ্ছেন খলীফা।

আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা

রাষ্ট্রপ্রধানের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে বিবদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করা। ঝগড়া-বিবাদ ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও ফয়সালায় ইসলামী আইন অনুসরণ করা।

শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণ

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতি ও বিপদ-আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা। স্বাধীন নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ দেওয়া খলীফার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক কথায় শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and order) স্থাপন ও সংরক্ষণ করা।

সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হারাম ও অবৈধ কাজ যাতে কেউ করতে না পারে, কোন নাগরিকই যেন স্বীয় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। অন্য কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন, দুর্বলকে শক্তিশালী করা এবং সবলদের সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করা, সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা

বৈদেশিক ও বিজাতীয় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে দেশকে, দেশের জনগণকে এবং তাদের জীবন-সম্পদ, মান-ইজ্জতকে রক্ষা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন ও সামর্থ্য সংগ্রহ করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় আয়ের ব্যবস্থা ঃ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামী শরীআত মোতাবিক রাষ্ট্রের কর, খাজনা ও অন্যান্য সরকারি পাওনা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা ও তা আদায় করার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

বায়তুলমাল সংরক্ষণ

রাষ্ট্রের বায়তুলমাল সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের আর একটি দায়িত্ব। বায়তুলমাল থেকে যাকে যা দেয়া হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ এবং যথাযথভাবে তা দেয়ার ব্যবস্থা করা, অপচয় না করা ইত্যাদি খিলাফত প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব।

নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

দায়িত্বশীল, নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, তাদের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া, তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিপথগামীদের সুপথে আনয়ন

পথভ্রষ্ট ও বিপথগামীদেরকে ইসলামের সুমহান পথে ফিরে আনার পদক্ষেপ গ্রহণও খলীফার দায়িত্ব। অর্থাৎ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পুরো দায়-দায়িত্বটাই খিলাফত ব্যবস্থার উপর ন্যস্ত।

সামগ্রিক দায়িত্ব

সকল জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া, পরিস্থিতির অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন সার্বিকভাবে গোটা উম্মাহ রক্ষা পায় এবং মিল্লাত সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সামগ্রিক সংরক্ষণ, নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা সর্বোপরি আল্লাহর বিধান জারি ও সংরক্ষণ করাই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের খীলফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যত ব্যাপক ও সর্বজনীন তাঁর অধিকার ও তত বিরাট। তাঁর অধিকার হলো এই যে, তাঁর নির্দেশ সবাইকে শুনতে হবে ও পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ .

"হে মুমিনগণ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من أطاعنى فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصى الله و من يطع الأمير فقد أطاعنى و من يعص الأمير فقد عصانى .

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে নিজের আমীরের আনুগত্য করে, সে মূলত আমার আনুগত্য করে এবং যে আমীরের অবাধ্য সে বাস্তবে আমারই অবাধ্য।" (মুসলিম ঃ ২য় খন্ড)

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা প্রতিটি নাগরিকের জন্য ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।

ভালোবাসা ঃ

আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানকে ভালবাসাও রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অধিকার। বাইরে যেমন তাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, তেমনি অন্তরেও তাঁর প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে। মহানবী (স) বলেন ঃ

خيار أئمتكم الذين يحبونهم و يحبونكم و تصلون عليهم و يصلون عليكم و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم .

"তারা তোমাদের ভালো খলীফা যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, তোমাদেরকেও তারা ভালোবাসে এবং যাদের জন্য তোমরা দুআ করো, তোমাদের জন্য তারা দুআ করে। অনুরূপভাবে তারাই তোমাদের মন্দ খলীফা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো ও তারাও তোমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং যাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ দাও, তোমাদের প্রতিও তারা অভিশাপ প্রদান করে।" (মুসলিম ঃ কিতাবুল ইমারত)

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে এমনই হতে হবে। মানুষ তাঁর জন্য সদিচ্ছা পোষণ করবে। অন্তর থেকে তাঁর মংগল কামনা করবে। মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁর জন্য ভক্তি ভালোবাসা উপচে পড়বে। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হাতে "বায়আত" আনুগত্যের শপথ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের প্রকাশ বলা হয়নি বরং আন্তরিকতা ও ভালোবাসারও শপথ।

দ্বীন ও আখিরাতের জন্য বায়আত ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের তৃতীয় অধিকার হলো এই যে, তাকে শুধু দুনিয়ার নয় বরং দ্বীনের জন্যও প্রয়োজন মনে করতে হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে এ ব্যাপারে বায়আত করতে হবে, তার পেছনে আসলে প্রেরণা হবে কেবল আখিরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। মহানবী (স) বলেন ঃ

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ..... و رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا.

"তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না।..... এক ব্যক্তি হলো যে, কেবল দুনিয়ার স্বার্থে খলীফার হাতে বায়আত করে।" (বুখারী ঃ ২য় খন্ড, কিতাবুল আহকাম)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের খলীফার কাছে বায়আত ও আনুগত্য কেবল দুনিয়ার জন্যই নয় ; বরং দ্বীন ও আখিরাতের জন্য হতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি

ইসলামী রষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত মর্যাদা হলো তিনি হচ্ছেন জাতির উকীল ও জাতির সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বশীল। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দায়িত্ব বিরোধী কোন কাজ করলে বা অক্ষমতা অথবা উপেক্ষার দরুণ তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতির রয়েছে। যেহেতু জাতির জনগণই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে, কাজেই তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতিরই থাকতে হবে। ইসলামী শরীআতে এ অধিকার স্বীকৃত। যে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে না এবং তার বিধান অনুসরণ করে না, তাঁর আনুগত্য করা কিছুতেই বৈধ হবে না। মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন ঃ

وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً.

"তুমি তার আনুগত্য করেনা-যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।" (সূরা আল-কাহাফ : ২৮)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَلاَ تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ .

"এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করোনা, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করেনা।" (সূরা আশ-শুরা-১৫১-১৫২)

আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا .

"আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ট অথবা কাফির তার আনুগত্য করো না।" (সূরা দাহার-২৩-২৪)

ইসলামী রাজনীতিবিদ ও ফিকহবিদগণ শরীআতের বিভিন্ন দিক বিচার বিশে-ষণ করে বলেন যে, যে রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিকৃতিগুলো পরিদৃষ্ট হবে তাকে পদচ্যুত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজা সাধারণের অধিকার আদায় না করেন এবং তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালান।

২. তিনি যদি জনগণকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেন।

৩. তিনি যদি অসৎ চরিত্রের অধিকারী হন, প্রকাশ্যে শরীআতের নির্দেশাবলীর বিরোধিতা করেন এবং অন্যায় ও গর্হিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকেন।

৪. তিনি যদি দীন ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহে পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলীর অনুপ্রবেশ ঘটান।

৫. ইসলাম থেকে তাঁর দূরত্ব যদি এমন পর্যায়ে যায় যে, তিনি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ও আইনের পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলীর অনুপ্রবেশ ঘটান।

৬. তিনি যদি ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ পরিহার করেন এবং কুফরী আকীদা গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে-'মি' লিখুন

১. আরব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে খলিফাতুল মুসলিমীন বলা হয়।

২. খলীফা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন।

৩. খিলাফত হল দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাসূল (স) -এর আনুগত্য করা।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র হচেছ কল্যাণমূলক আদর্শিক রাষ্ট্র।

৫.

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কুরআন-হাদীসের আলোকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩. রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪. রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৫. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে কি পদচ্যুত করা যায়? আপনার মতামত সংক্ষেপে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।